২.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.২.১ কালানুক্রমিক বিন্যাস

শরৎচন্দ্রের ছোট-বড় উপন্যাসের প্রায় ত্রিশ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'বড়দিদি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস', এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে।

মধ্যবর্তী সময়ে অনেকগুলি উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, কালানুক্রমিক ভাবে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হল :

বিরাজ-বৌ (২ মে, ১৯১৪), পরিণীতা (১০ আগস্ট, ১৯১৪), পণ্ডিতমশাই (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৫ জানুয়ারি, ১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১২ মার্চ, ১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (৫ জন, ১৯১৬), অরক্ষণীয়া (২০ নভেম্বর, ১৯১৬); শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭), দেবদাস (জুন, ১৯১৭), চরিত্রহীন (নভেম্বর, ১৯১৭), স্বামী (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮), শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮), দত্তা (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮), ছবি (জানুয়ারি, ১৯২০), গৃহদাহ (মার্চ, ১৯২০), বামুনের মেয়ে (সেপ্টেম্বর, ১৯২০), দেনাপাওনা (আগস্ট, ১৯২৩), নববিধান (অক্টোবর, ১৯২৪), পথের দাবী (আগস্ট, ১৯২৬), শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব (এপ্রিল, ১৯২৭), শেষ প্রশ্ন (মে, ১৯৩১), শ্রীকান্ত, চতুর্থপর্ব (মার্চ, ১৯৩৩) এবং বিপ্রদাস (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫)। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় শুভদা (জুন, ১৯৩৮) এবং তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' (জুন, ১৯৩৯) যা সমাপ্ত করেন রাধারানি দেবী।

২.২.২ বিষয়ভিত্তিক বিভাগ

বিষয় হিসাবে শরৎচন্দ্রের যে বিভাগ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তাকেই আমরা মোটামুটিভাবে যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাঁর বিভাগ এইরকম—

ক) প্রেমবর্জিত পারিবারিক বিরোধ-চিত্র,

Scanned with CamScanner

খ) সমাজবিধির প্রাধান্যচিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধকাহিনি,

গ) সমাজ-সমালোচনামূলক উপন্যাস,

ঘ) পূর্বরাগপুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম,

ঙ) নিষিদ্ধ সমাজ-বিরোধী প্রেম এবং

চ) মতবাদপ্রধান ও পূর্বানুবৃত্তিমূলক উপন্যাস

ক) পরিচিত পরিবারের অতি-পরিচিত কলহ, মন-কষাকষি, পারিবারিক রাজনীতি ইত্যাদি বাংলা উপন্যাসে তেমনভাবে কখনো উঠে আসেনি শরৎচন্দ্রের আগে। তাঁর অলিখিত 'মরমী সাহিত্যিক' আখ্যা পাওয়ার মূল কারণও এখানেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অবশ্য এর সূত্রপাত হয়েছে, একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলতে পারে। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, পারিবারিক বিরোধের চিত্র শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পেই বেশি ফুটেছে, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে কম। তবু যে-সব ক্ষুদ্র উপন্যাসে এই বিষয় অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে 'পণ্ডিতমশাই' ও বৈকুণ্ঠের উইল'-এর নাম করা যেতে পারে। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবন ও কুসুমের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার। কুসুমের পক্ষে প্রধান বাধা তার বৈধব্যজনিত সংস্কার, বৃন্দাবনের পক্ষে প্রধান বাধা তার মায়ের অপমান। 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে ভ্রাতৃস্নেহের চূড়ান্ত বিকাশ আমরা দেখতে পাই। আপাতদৃষ্টিতে অসভ্য, অশিক্ষিত এবং নেশাখোর বড়ভাই গোকুল তার শিক্ষিত ও আপাতসভ্য ভাই বিনোদের প্রতি যে কোমল এবং অন্ধ স্নেহ পোষণ করতো সেটাই এই কাহিনির উপজীব্য।

খ) সমাজ-বিগর্হিত প্রেম এবং সমাজব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সামাজিক বৃত্তের মধ্যে থেকেও কিছু উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছেন যেখানে বিদ্রোহের বিশেষ কোনো উত্তাপ পাওয়া যায় না। 'বড়দিদি'-তে অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ চরিত্রই কাহিনির প্রধান আকর্ষণ। এইরকম উদাসীন, অগোছালো এবং আপনভোলা মানুষের সঙ্গে বিধবা মাধবীর যে সম্পর্ক তার আন্তরিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা এতই বেশি যে একে প্রেম আখ্যা দিলে যেন সম্পর্কটিরই অবমাননা করা হয়। নিজেদের সম্পর্ক নয়, নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে অন্যান্য মানুষ কী চিন্তা করতে পারে, এই আশঙ্কাই উপন্যাসের উপজীব্য।

'চন্দ্রনাথ' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ উপন্যাস। এখানে চন্দ্রনাথ ও সরযুর প্রেমে সামাজিক কলঙ্কের একটা প্রেক্ষিত আছে, কিন্তু বিদ্রোহে কোনো সুর নেই। বিদ্রোহ বা সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র এ উপন্যাসে যদি কেউ থাকেন, তিনি কৈলাস খুড়ো। সামাজিক কলঙ্কের জন্য সরযুকে ত্যাগ করে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাকা মণিশঙ্করের অনুরোধে চন্দ্রনাথ যে তাকে আবার গ্রহণ করে, এটাই কাহিনির সারাংশ। কিন্তু চন্দ্রনাথের গভীর প্রেমই যে সমগ্র উপন্যাসকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে রেখেছে, সে কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে।

মিষ্টিমধুর প্রেমের উপন্যাস হিসাবে 'পরিণীতা'-র উল্লেখ করতে হবে। প্রায় খেলার ছলে একদিন ললিতা শেখরকে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিল। এই সামাজিক সম্পর্কটি বজায় রাখার জন্য তাদের অবিরাম প্রয়াস— ললিতাকেই অবশ্য এ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, কাহিনিকে আমাদের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছে। 'স্বামী' উপন্যাসকে কিছুটা এর পরিপূরক বলা যেতে পারে। শৈশবে অবৈধ প্রণয় অপেক্ষা দাম্পত্য প্রেমের মর্যাদা যে বেশি, সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে। অবশ্য কোনো নীতি উপদেশের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, স্বামী তার ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও প্রেম দিয়েই স্ত্রীকে জয় করে নিয়েছে। 'নববিধান' উপন্যাসের বিষয়ও দাম্পত্য প্রেম, তবে তা ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে যতটা জড়িত, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে ততটা নয়। এখানে অবশ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং নাটকীয়তা অনেক বেশি। সাহেবি জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এবং হিন্দুয়ানিকে সংস্কার হিসাবে গণ্য করা নায়ক, অধ্যাপক শৈলেশের প্রথম বিবাহ প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে উষার সঙ্গে। এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতে সময়

Scanned with CamScanner

লাগে নি, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঊষা স্বামীর কাছে আবার ফিরে আসে ও ব্যক্তিত্বের জোরে এবং কোমলতায় সংসারে হিন্দু আচার-ব্যবস্থা প্রচলিত করে। শৈলেশের ভগ্নী বিভা আবার সংসারে বিশৃঙ্খলা আনে, ফলে শৈলেশকে ঘর ছাড়তে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণতি মিলনমধুর। এইজাতীয় উপন্যাসের মধ্যে অনেকে 'বিরাজ-বৌ'কে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

গ) পল্লীসমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি এবং তার অমানুষিক শোষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন শরৎচন্দ্র। যে কয়েকটি উপন্যাসে পল্লীসমাজের এই স্বরূপ তিনি উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন সেগুলি হল 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', এবং 'পল্লীসমাজ'। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস যে 'পল্লীসমাজ' সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই— শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবেও এটি স্বীকৃত। 'অরক্ষণীয়া'তে সামাজিক দুঃশাসনের চিত্র অনেক তীব্র ও নির্মম, তুলনায় 'বামুনের মেয়ে' অনেক সহনীয়, কৌলীন্য প্রথার কুফলটুকুই এখানে দেখান হয়েছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে একটি নিটোল ও অনুক্ত প্রেমকাহিনির নিখুঁত প্রেক্ষিত গড়তে পেরেছে পল্লীসমাজের নিষ্ঠুরতা। গ্রামের ছেলে রমেশ দীর্ঘ প্রবাসের পর যখন পিতৃহীন হয়ে ফিরে এসেছে, বাল্যপ্রেমের নায়িকা রমা তখন বিধবা। গ্রামের ভালো করবার যাবতীয় প্রচেষ্টা তার বিফলে যায় সমাজপতিদের কূটকচালি ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। এরমধ্যে রমেশ ও রমার অস্ফুট প্রণয় সম্পর্ক উপন্যাসে আরো জটিলতা সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসে কেবল পল্লীসমাজের কুশ্রী দিকের প্রতিফলন নেই, সেই সঙ্গে সে সমস্যার প্রতিকারের একটা ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে জ্যাঠাইমা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। এটাও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ।

ঘ) পূর্বরাগপুষ্ট মধুর প্রেমের যেসব উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখেছেন তার মধ্যে দুটিই উল্লেখযোগ্য—'দত্তা' এবং 'দেনা-পাওনা'। 'দত্তা' উপন্যাসটি আদ্যন্ত মধুর এবং সুখপাঠ্য। নরেন এবং বিজয়ার পূর্বপ্রণয় সত্ত্বেও, বিজয়ার পিতা বনমালী তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসবিহারীর পুত্র বিলাসকেই মনে মনে জামাতা ঠিক করে রেখেছেন, এই বিশ্বাসে বিজয়া পিতৃ-ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বদরাগী ও অভদ্র বিলাসকে মনে মনে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়েছিল। বিলাসও এর পূর্ণ সুযোগ নিত। কিন্তু পরে জানা যায়, বনমালী জগদীশের পুত্র নরেনকেই জামাই হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং ডাক্তারি পড়াবার জন্য নিজের খরচেই বিলাত পাঠান। শেষপর্যন্ত অবশ্য মধুরেন সমাপয়েৎ হয়েছে, চূড়ান্ত নাটকীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে বিজয়া-নরেনের বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দেনা-পাওনা শরৎচন্দ্রের জটিল উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি। তাঁর প্রথাগত চরিত্রনির্মাণও এখানে ঠিক যেন লক্ষ করা যায় না। এর নায়ক জীবানন্দ শরৎচন্দ্রের একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। লম্পট, দুর্বৃত্ত, পাপাচারী, অর্থপিশাচ— যত মন্দ কথা একটি চরিত্র সম্বন্ধে বলা সম্ভব, সব কিছুই চরিত্রটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে। তার নিজের বিবাহিত অথচ পরিত্যক্ত স্ত্রীই এখন তার অধিকারভুক্ত চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এই অকুতোভয় লম্পট মানুষটির হৃদয়ে কী ক'রে প্রেমের সঞ্চার হল এবং সংসার জীবনে প্রবেশ করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল, সেটাই এ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। নির্মল-হৈমর উপকাহিনিটিও উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং ফকির চরিত্রটি প্রায় অবিস্মরণীয়।

ঙ) সমাজবিরোধী প্রেম এবং মানুষের ওপরে প্রেমের দুর্নিবার প্রভাব শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতির মূলে প্রধানত এই উপন্যাসগুলিই আছে। এ সব উপন্যাসে সমাজের স্খলিতা নারীদের তিনি সহানুভূতির সঙ্গে স্থান দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে, তাদের সমাজবিগর্হিত প্রেমকে যথোচিত মর্যাদাও দিয়েছেন, যদিও দাম্পত্যবন্ধনে তাদের সার্থক করে তোলার ব্যাপারে কিছু সংকোচ তাঁর ছিল বলেই মনে হয়। তাঁর এ জাতীয় তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' এবং 'শ্রীকান্ত'। চরিত্রহীন উপন্যাসে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি এবং তার মাধ্যমে মানুষকে বিচার করার সনাতন পদ্ধতির ওপর তীব্র ব্যঙ্গ আছে। মানুষের চরিত্রবিচারে Ethics নয়, মানবিক গুণাবলিরই বিচার হওয়া উচিত এবং মনস্তত্ত্ব এমনই জটিল যে তা সামাজিক অনুশাসনে বদ্ধ হবার নয়, এই ধরনের বক্তব্যই এখানে আছে। দুটি কাহিনি এখানে পরস্পরযুক্ত

Scanned with CamScanner

সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনি এবং উপেন্দ্র-কিরণময়ী-দিবাকরের কাহিনি। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দুটি ক্ষেত্রেই অসামাজিক সম্পর্ককে একই সঙ্গে অনৈতিক বলেও আমরা ঘোষণা করতে পারি, কিন্তু মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আর অস্বাভাবিক বলতে পারিনা।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা শেষপর্যন্ত মহিমকে বিবাহ করেছে বটে, কিন্তু প্রাণোচ্ছল সুরেশ সম্বন্ধে মোহমুগ্ধতার ভাব তার কখনোই কাটেনি। ফলে তার দাম্পত্য জীবনে তা বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের বৃহত্তম এবং জনপ্রিয়তম উপন্যাস। অসামাজিক সম্পর্ক এখানে প্রধানভাবে আছে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের সম্পর্কে, তবে অভয়ার সঙ্গে রোহিনীর সম্পর্ক, কমললতার সঙ্গে গহরের সম্পর্ক সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে গর্হিত তো বলতেই হবে।

চ) মূলত দুটি উপন্যাসকেই আমরা মতবাদ প্রধান উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি, তার মধ্যে 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন'। এজাতীয় উপন্যাসের জন্য শরৎচন্দ্রের পরিচিতি নয় এবং এরকম উপন্যাস লিখতে যে তিনি বিষয় সাচ্ছন্দ্যও বোধ করেন না, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে তার সাক্ষ্য আছে। নারীর মূল্য বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে তিনি অনেক সহজ। অবশ্য বিতর্কিত ও ব্যতিক্রমী উপন্যাস হিসাবে 'শেষ প্রশ্ন'-ও তাৎপর্যপূর্ণ। নায়িকা কমল চরিত্রটিই সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

২.২.৩ শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমকালের তরুণ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাদের বাস্তব সমস্যা এবং বাস্তব চরিত্রচিত্রণের জন্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হবে, বাস্তব সমস্যা অপেক্ষা পারিবারিক মনস্তত্ত্ব এবং হৃদয়াবেগ ঘটিত সমস্যাগুলিই তিনি প্রধান উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। চরিত্রচিত্রণে তিনি সাধারণ মানুষকে আত্মীয় করে আমাদের সচেতন করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টিতে এক ধরনের ছক বা প্যাটার্নই প্রমাণ করে, তিনি বাস্তব চরিত্রসৃজনে যতটা আগ্রহী ছিলেন, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ভালো লাগার মতো চরিত্রনির্মাণে উৎসাহ বোধ করেছেন আরো বেশি। এই ছকটি অনেক সমালোচকেরই চোখে পড়েছে। তাঁর নায়করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, সাংসারিক জ্ঞানশূন্য উদাসীন চরিত্র—'অর্থ উপার্জন করে জীবনে স্থিতিশীল হওয়া এবং সম্পন্ন সংসারের প্রতিষ্ঠা করা যাদের চিন্তাতেই আসে না। আবার নায়িকাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে, এই ধরনের চালচুলোহীন চরিত্রের প্রতিই তাদের আকর্ষণ বেশি। নায়িকারা ব্যক্তিত্বময়ী, অথচ অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সময় একবার স্খলিত। তারা প্রত্যেকেই সেবাময়ী, নায়কের দুরবস্থায় একবার অন্তত সেবা করার ও নিপুণভাবে যত্নসহকারে খাওয়াবার সুযোগও একবার পেয়ে যায়। এর ফলে চরিত্রগুলির মূল্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা যে কমে যায়, এমন নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব চরিত্রের এরকম কোনো ছক থাকে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ জন্মায়। তবে বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র যে এক যুগন্ধর স্রষ্টা সে বিষয়ে সমালোচকগণ সকলেই একমত।

২.৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ছোটগল্পকার হিসাবেই বেশি পরিচিত এবং তাঁর সামর্থ্যও ছোটগল্পেই অধিক, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। 'দেবী' উপন্যাসের সূত্রেই তিনি উপন্যাসিক হিসাবে বেশ কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছেন, যদিও আরো কয়েকটি ভালো উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন।

ইংরিজি সাহিত্যে উপন্যাসের মূল দুটি ভাগ, নভেল এবং স্টোরি-টেলার। প্রভাতকুমারকে আমরা দ্বিতীয়ভাগের

Scanned with CamScanner

ঔপন্যাসিক বলতে পারি, অর্থাৎ গল্পকথনই ছিল যাঁর মূল উদ্দেশ্য। এটাও অবশ্য খুব কম কৃতিত্বের কথা নয়, কাহিনির আকর্ষণ পাঠকের মনে সৃষ্টি করা এবং সর্বক্ষণ তা জাগরূক রাখা এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। প্রভাতকুমার সেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এটাই আমরা বলতে পারি যে, যে-গভীর জীবনসমস্যা মহৎ ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে আমরা পাই, জীবনের যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা তিনি ঘটনাংশের মধ্য দিয়ে করেন, প্রভাতকুমার তার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল [illegible] বাঙালি পাঠককে কাহিনিসূত্র দিয়েই সম্মোহিত করে রাখা।

প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও এই সূত্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে। উপন্যাসে অনেকে চরিত্রের ওপর বেশি নির্ভর করেন, যেমন শরৎচন্দ্র, কিন্তু অনেকে চরিত্র অপেক্ষা কাহিনিভাগের ওপর জোর দেন বেশি। প্রভাতকুমারের কাছে কাহিনিই ছিল প্রায় সর্বস্ব, সুতরাং চরিত্রসৃষ্টির গুরুত্ব ছিল তাঁর কাছে কম। সেই কারণেই তাঁর চরিত্রগুলি দোষেগুণে রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে কিছুটা একমুখী। অবশ্য মন্দ চরিত্র বা খল চরিত্র সৃষ্টি করতে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না বলেই চরিত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে আদর্শ এবং ভালো লাগার মতো।

প্রভাতকুমারের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর উপন্যাসের কাহিনিগুলি অনেকক্ষেত্রেই মনে হয় যেন ছোটগল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ। ছোটগল্প হিসাবে যা গুণসংবদ্ধ হতে পারত, উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যেন অনাবশ্যকভাবে তা শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তা কখনো কখনো সামান্য আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে।

২.৩.১ প্রভাতকুমারের উপন্যাস

সংখ্যায় প্রভাতকুমারের উপন্যাস খুব বেশি না হলেও নিতান্ত অল্প নয়। 'আরতি', 'গরীব স্বামী' প্রভৃতি অপরিচিত উপন্যাস যেমন আছে, 'রত্নদীপ' বা 'সিন্দুর কৌটা'-র মতো জনপ্রিয় উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। উপন্যাসগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে।

প্রভাতকুমারের প্রথম উপন্যাস 'রামসুন্দরী' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩০৯ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এবং গ্রন্থাকারে এটির প্রকাশ ঘটে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। রমাসুন্দরীই উপন্যাসের নায়িকা এবং প্রধান চরিত্র। কাহিনির প্রথম ভাগে চরিত্রটি যেভাবে বিকশিত হয়েছে, পরিণয়োত্তর জীবনে সেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই। কাহিনিতে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে কুটিল চরিত্র সীতানাথ ও তার মা, কঠোর চরিত্র কান্তিচন্দ্র এবং স্বাধীনচেতা নবগোপাল। কিন্তু শেষাংশে কাশ্মীরভ্রমণ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসটি তেমন আকর্ষণীয় হতে পারে নি।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'নবীন সন্ন্যাসী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। জমিদারের সঙ্গে জমিদারের রেষারেষি, কূটচক্রান্ত, মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত করবার চেষ্টা ইত্যাদি মামুলি ঘটনার সমাবেশই উপন্যাসে দেখা যায়। নায়ক মোহিত এবং নায়িকা চিনিও ঠিক মনে রাখবার মত চরিত্র নয়। তবে উপন্যাসের যদি কোনো সত্যকার আকর্ষণ থাকে, তবে তিনি নায়েব গদাই পাল। এই চরিত্রসৃষ্টি প্রভাতকুমারের প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলতে হবে। এই জাতীয় চরিত্র নির্মাণে যে আদর্শ তিনি রচনা করেছেন, পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের কাছে তা অনুসরণযোগ্য হয়ে রয়েছে। জমিদার গোপীকান্তর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা, যাবতীয় মিথ্যাচারের মধ্যে নিমগ্ন থেকেও ধর্মীয় ভণ্ডামি, বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বশীভূত করার কৌশল, কূটমন্ত্রণা এবং নিপুণ রণকৌশলে রমন ঘোষকে পর্যুদস্ত করা, হরিদাসীর সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেমাভিনয়—সব কিছুতেই চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'রত্নদীপ' সম্ভবত প্রভাতকুমারের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। চরিত্রসৃষ্টি এ উপন্যাসে অনুল্লেখ্য, একথা বলা যাবে না, কিন্তু প্রধানত ঘটনাজাল বিস্তার ও নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যই এটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রাখাল এবং সুরবালার কাহিনি আমাদের ভালো লাগে, প্রায় ভিলেন হিসাবে আঁকা চরিত্র খগেনও আকর্ষণীয়, কিন্তু

Scanned with CamScanner

উপন্যাসের মূল আকর্ষণ বৌরানি চরিত্র। শুচিশুদ্ধ পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে বৌরানির চরিত্রটি এমনভাবে লেখক এঁকেছেন যে, নাটকীয় বিপর্যয়ের পর নিজের ভুল ভেঙে গেলে যে আচরণ বৌরানি করেছেন, মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও তাকে একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতে আমরা পারিনা। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসে, রমেশ তার স্বামী নয় এ কথা জানবার পর কমলার আচরণ যদি আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিই, তবে বৌরানির আচরণকেও অস্বাভাবিক মনে করবার উপায় নেই। রাখাল অবশ্য বৌরানির কিছু ক্ষতি নিশ্চয়ই করতে পারতেন, কিন্তু বৌরানির স্নিগ্ধোজ্জ্বল চরিত্রই তাকে এ ব্যাপারে প্রতিহত করেছে বলে আমাদের মনে হয়। 'সিন্দুরকৌটা' উপন্যাসটিও প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও মনে করেছেন 'উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণকাহিনি', কিন্তু একে উপন্যাস হিসাবে অভিহিত না করার কোনো কারণও আমরা দেখতে পাইনা। পরকীয়া প্রেমই এই উপন্যাসের বিষয়। দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে মূল্যবোধ, বিশ্বাসভঙ্গের জন্য অপরাধবোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে সজীব করে রেখেছে। স্বামী-পরিত্যক্তা সুশীকে বলা যায় এই উপন্যাসের নায়িকা এবং বকুরানির স্বামী বিজয়কে বলতে পারি উপন্যাসের নায়ক। করুণা শেষপর্যন্ত প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বাংলা ও ইংরেজি উপন্যাসে আমরা আগেও দেখতে পেয়েছি। এখানেও তাই হয়েছে—বিজয় সুশীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিবাহের সংকল্প করেছে। এই সংকল্পে প্রতিবন্ধকতা ছিল খুবই অল্প, কারণ পতির সুখে আত্মবিসর্জনের পরম সতীত্বই বকুরাণির চরিত্রের ভিত্তি। এই চরিত্রকে বৈপরীত্যের দ্বারা স্পষ্টতর করেছে পল সাহেবের চরিত্র, স্ত্রী যাঁর কাছে পণ্যসামগ্রী মাত্র।

'জীবনের মূল্য' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। চূড়ান্ত নাটকীয় ঘটনার দ্বারা জগদীশ বাবুর পরিবারের ব্যাপক বিপর্যয় দেখানো লেখকের অভিপ্রায় ছিল। পর পর যে দুর্ঘটনাগুলি এই পরিবারে ঘটে যায়, তা নিছকই দৈব দুর্ঘটনা, অথচ উপন্যাসে আমরা একটা কার্যকারণ সূত্র অবশ্যই প্রত্যাশা করি, দৈব দুর্বিপাক উপন্যাসের পক্ষে খুব ভালো যুক্তি হতে পারে না। মনে হতে পারে বিয়ে-পাগলা বুড়ো গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের অভিশাপেই বুঝি এই এই ধরনের বিপর্যয় ঘটে চলেছে, কিন্তু তাকেও খুব বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

প্রভাতকুমার আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যথা 'মনের মানুষ', 'আরতি', 'সত্যবালা', 'গরীব স্বামী', কিন্তু এগুলি কোনোটিই খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কাহিনিবয়নের দক্ষতায় এগুলির পঠনযোগ্যতা যতোটা আছে, উপন্যাস হিসাবে পরিগণিত হবার মতো যোগ্যতা ততটা নেই।

২.৪ জগদীশ গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) খুব পরিচিত নাম নয়, কারণ তিনি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না, কিন্তু শক্তিশালী লেখক যে ছিলেন সে স্বীকৃতি সুকুমার সেনের মতো সমালোচকও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে শাখাপতিও হইতে পারেন নাই' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থখণ্ড। পৃ. ৩৪০)

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত নামেই তিনি লেখা শুরু করেন, পরে নামের মধ্যাংশ বর্জনের যে হুজুগ তখন আধুনিকতার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, সেই প্রথাতেই এই সংক্ষেপীকরণ ঘটে। ছোটগল্প রচনার মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন, অতঃপর উপন্যাস রচনা শুরু করেন একই সঙ্গে। যেহেতু তিনি প্রথা বর্জন করেছেন এবং স্বতন্ত্রচিহ্নিত বিষয় ও ভঙ্গিমায় সাহিত্যরচনা করেছেন, তাঁর মানসিকতার বৈশিষ্ট্য একটু না জেনে রাখলে তাঁর উপন্যাস উপভোগ করা সম্ভব হবে না।

সাধারণভাবে যাকে বলে 'কল্লোল যুগ', জগদীশ গুপ্ত সেই সময়েরই লেখক, তবে তাঁকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক

Scanned with CamScanner

কথাটা ঠিক হবে না। পারিবারিক আড্ডায় তিনি বিশেষ আসেন নি। বোলপুরে থাকতেন কর্ম-উপলক্ষে, সেখান থেকেই লেখা পাঠাতেন। তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনির সঙ্গে যিনি পরিচিত আছেন, তিনিই মানুষটির স্বাধীনচেতা মানসিকতাকে চিনে নিতে পারবেন। আইন ব্যবসায়ের জন্য সুপরিচিত পরিবারের মানুষ এই ব্যবসায়ে মিথ্যা কথা বলতে হয় বলে আইন পড়েন নি এবং দাসত্ব করতে হয় বলে কোনো চাকরিও বিশেষ করেন নি। ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য জীবনে কখনোই তেমন লাভ করতে পারেন নি তিনি। নিঃসন্তান এই মানুষটি সুকুমারী বলে একটি পালিতা কন্যার জনক, সে সুকুকে নিয়ে তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও গল্প আছে।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস প্রথাবিরোধী এবং তিনি কল্লোলযুগীয়, এ দুটি কথা বলার অর্থ, উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য গ্রহণ করেন নি এবং কল্লোল যুগের লেখকদের মতো বাস্তববাদী উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন। জীবনের আদর্শ ও নৈতিক রূপ, জীবনের সুন্দর রূপ এবং জীবন যেমন হলে আমাদের ভালো লাগতো, উপন্যাসে সেই জীবনের চিত্র না এঁকে জীবন প্রকৃতই যেরকম, সেই জীবনই তিনি এঁকেছেন। ফলে মানুষের প্রকৃত চেহারা ও জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে।

উপন্যাসে নিটোল কাহিনি জগদীশ গুপ্তের একেবারেই অপছন্দ ছিল। জীবনের যেহেতু কোনো সুন্দর ছক নেই, উপন্যাসেও কোনো সুষ্ঠু ছক তিনি পছন্দ করেন নি। সাধারণত ছোট মাপের উপন্যাসই তিনি লিখতেন, এ ব্যাপারে কোনো রকম আপোস তিনি পছন্দ করতেন না। 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের ভূমিকা থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসের কিঞ্চিত কলেবরবৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রকাশক, লেখকের উত্তর ছিল—'যে উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন এবং যে ঘটনা বিস্তারের যতটুকু ক্ষেত্র আছে, তার বেশি কোনো ফরমাশি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

২.৪.১ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস

জগদীশ গুপ্ত ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস কিছু কমই লিখেছেন। তাঁর মোট উপন্যাসের সংখ্যা আঠারো, কলেবরে কোনোটিই খুব বড় নয়। বিভিন্ন তথ্য থেকে মনে হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'লঘুগুরু'-ই তাঁর প্রথম উপন্যাস। অথচ তাঁর দীর্ঘতম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ'-র প্রকাশ কাল হিসাবে উল্লেখ আছে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তাঁর আরো কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, এগুলি হল—'তাতল সৈকত', 'দুলালের দোলা' এবং 'রোমন্থন'। 'সতিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। অন্যান্য উপন্যাসের নাম, প্রকাশকালসহ—'রতি ও বিরতি' (১৯৩৪), 'গতিহারা জাহ্নবী' (১৯৩৫), 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' (সম্ভবত ১৯৩১), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), জগদীশ গুপ্তের কয়েকটি উপন্যাসের প্রকাশকাল সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায় নি, এগুলি হল, 'যথ', 'নন্দ আর কৃষ্ণা', 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ', 'মহিষী', 'যথাক্রমে' এবং 'সমভোগ'। তাঁর 'চৌধুরাণী' উপন্যাসটি সম্ভবত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, এটি 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ থেকে আষাঢ় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তেরোটি সংখ্যায়।

২.৪.২ জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের বিষয়-বিভাগ

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে কাহিনির পরিণতি অপেক্ষা বক্তব্যবিষয় এবং চরিত্রনির্মাণের গুরুত্ব অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও উপন্যাসগুলির বক্তব্যবিষয়ভিত্তিক কয়েকটি বিভাগ আমরা করতে পারি :

ক) নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে উপন্যাস,

খ) পল্লীসমাজের প্রকৃত সমস্যা-বিষয়ক উপন্যাস এবং

গ) অলঙ্ঘ্য ভবিতব্য বিষয়ক উপন্যাস।

Scanned with CamScanner

ক) নারী ও পুরুষের প্রকৃত সম্পর্ক, তাদের সম্পর্ক বিষয়ে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ, দাম্পত্য সম্বন্ধের ক্লেদ, আদর্শ দাম্পত্য সম্বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস জগদীশ গুপ্ত লিখেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সম্পর্কের বাস্তব চিত্রটি তিনি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, ফলে তার যাবতীয় ক্লেদ, মলিনতা, অপবিত্র সামঞ্জস্য ইত্যাদিই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। সেই কারণেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ধারণায় পুষ্ট পাঠকসমাজ বিপর্যস্ত এই সব উপন্যাসের মুখোমুখি এসে। কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করলেই সে কথা আমরা বুঝতে পারবো।

'লঘুগুরু' জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাস, কারণ 'জগদীশের রচনা-নৈপুণ্য' আছে, এ কথা স্বীকার করেও বিভিন্ন অসংগতি দেখিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। কাহিনির নায়িকা একটি গণিকা উত্তম, মানুষকে পিশাচে পরিণত করার খেলা খেলতে খেলতে সহসাই যে বিপরীত পথে শয়তানকে শাসন করে মানুষে পরিণত করার একটি খেলা খেলে বিশ্বম্ভরকে নিয়ে। নিজের মেয়ে টুকিকে সে সৎশিক্ষা দিয়ে সৎপাত্রস্থ করতে চায়, কিন্তু তার সমস্ত আশা ব্যর্থ হয়, কারণ একদা যে গণিকাবৃত্তি করেছে ভবিষ্যতে তার শুদ্ধজীবনাগ্রহ কেউ মেনে নিতে পারে না, তার কন্যাকেও কেউ সৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। তাই সংসার জীবনে প্রবেশ করার পরও টুকিকে শেষ পর্যন্ত 'ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে' গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে আমরা কৃষ্ণা নামে এক স্বভাবগণিকাকে দেখতে পাই, যেরকম চরিত্র বাংলা উপন্যাসে বিরল। তার নিজের মা উপন্যাসের শেষে বলেছে, ঈশ্বর ওকে ভালবাসার ক্ষমতাই দেন নি, 'রূপ আছে' রূপের জোরে মানুষকে খেপিয়ে তুলে মজা দেখাই ওর জন্মগত অভ্যাস।' বিবাহিত এই মেয়েটি উপন্যাসের আখ্যান-অংশে মজা দেখেছে গৃহশিক্ষক নন্দকে ক্ষেপিয়ে তুলে। নগ্ননায়িকাকে প্রথম দর্শনে এবং তার এই চেহারা মানুষ দেখুক, সেটাই তার পছন্দ, এমন কথা শুনে শিক্ষকতা ফেলে পালিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু নারীসৌন্দর্যের মোহে আবার যেতে হয়েছিল, যদিও বিপর্যয় শেষপর্যন্ত হয় নি।

'সুতিনী' উপন্যাসের নায়িকা রাজবালা এক অর্থে বিদ্রোহিনী নারী, কিন্তু পাঠক-মনোরঞ্জনের উত্তেজক রসদ সে নয়, আধুনিকতা প্রদর্শনের হাতিয়ারও নয় সে। হাইস্কুলের মাস্টার দুর্গাপদর সঙ্গে রাজবালার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কে অশান্তি প্রবেশ করেছিল সন্তানের কারণে, সন্তান হয়ে, আঁতুড়েই মারা যায়। প্রথম প্রথম সে শুনতো, এটা অদৃষ্টের দোষ, তারপর শুনতো নিজের দোষ। বিদ্রোহ করেনি, কিন্তু তার মনে হয়েছিল, 'অদৃষ্ট আর আমরা! দায়ী করা যেতে পারে মাঝখানে এমন কি কেউ নেই?' এমন কেউ আছে কিনা জানবার পরীক্ষাতেই, অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দিয়েছে রাজবালা, সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় নয়—এ কথাটাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

নারীব্যক্তিত্ব যে দাম্পত্যবন্ধনের চেয়েও মূল্যবান, এ কথা 'যোগাযোগে'র নায়িকা কুমুদিনী আংশিকভাবে হলেও দেখিয়েছিল, জগদীশ গুপ্ত তা দেখিয়েছেন 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে। কুমুদিনীর মতই পরিণতিতে এই উপন্যাসের নায়িকা কিশোরীকে মেনে নিতে হয় স্বামীকে, কারণ সে বাংলা দেশের মেয়ে। বিদ্রোহ কিছুটা হলেও জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের নায়িকার মধ্য দিয়ে।

আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের কোন দৃঢ়তা তাকে রক্ষা করে এবং আদর্শ বিবাহ-অনুষ্ঠান কেমন হলে সংগত হয়, এসব জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে; 'চৌধুরাণী' উপন্যাসেও বক্তব্য কিছুটা এই ধরনেরই। যে বিবাহ-ব্যবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে—বিবাহবন্ধনে মিলনেচ্ছু পাত্রপাত্রী নিজেরাই যাবে কোনো দেব মন্দিরে এবং পুরোহিত তাদের মিলনের স্বীকৃতি দেবেন—এমন ব্যবস্থা বাস্তবে হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু এই আদর্শ বিবাহপদ্ধতি যে তাঁর বিশেষ চিন্তারই ফসল সে কথা আমরা বুঝতে পারি।

Scanned with CamScanner

খ) পল্লীসমাজের কথা শরৎচন্দ্রই তাঁর উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন প্রথম, এমন সম্মান শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হয় এবং তা যে অযৌক্তিক, এমন কথাও বলা যাবে না। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত যে সামান্য কয়েকটি উপন্যাসে পল্লীসমাজকে উপস্থাপিত করেছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে, জগদীশ গুপ্তের গ্রাম্য সমাজ, সমাজের আচার-অনুষ্ঠান এবং গ্রামীণ মানুষদের মনোভাব সম্বন্ধে ধারণা কত প্রখর ও গভীর ছিল। এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেশি না থাকলে এসব কথা বলা যায় না।

উপন্যাসে নিটোল কাহিনিগ্রন্থন জগদীশ গুপ্তের খুব পছন্দ নয়, তা সত্ত্বেও তাঁর 'যথাক্রমে' উপন্যাসে কাহিনি আছে—একটি নয়, দুটি। প্রথম কাহিনিতে দীনবন্ধুর আদরের বোন, শান্ত ও অতি নম্রস্বভাবের মেয়ে সাবিত্রী তার কোমল স্বভাবের জন্যই শাশুড়ির কাছে অকথ্য নির্যাতন লাভ করে। একদা জ্বরের প্রবল ঘোরে এর সমাধান সাবিত্রীর মাথাতেই এসে যায় এবং তা প্রয়োগ করে। সুফল যে ফলেছে, অনতিকাল পরেই তা জানা যায়—'এখন শাশুড়ি যদি বলে এক কথা সাবিত্রী শোনায় তাকে দশ কথা—শাশুড়ি যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ।'

দ্বিতীয় কাহিনিতে শহরের পাশকরা ডাক্তার নিত্যপদ সেবাধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং গ্রাম সম্বন্ধে প্রচুর কল্পিত ভাবাবেগ নিয়ে ক্রমে এসেছে চিকিৎসা করতে, ও সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ফণীভূষণ কেবল রঙিন জল খাইয়ে এবং ডাক্তারির বিশেষ কিছু না জেনেও যে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে কী করে হাত করে রাখতে পেরেছিল, সে কথা নিত্যপদ বুঝতে পেরেছে অনেক পরে। প্রথম কথা, দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে ডাক্তারের ফি ছাড়া উচিত নয়; 'প্রাপ্য ছাড়লে প্রণয় বাড়ে এ কথা ভুল।' দ্বিতীয় কথা নাগরিক ভদ্রতার জ্ঞান এখানে অচল, সকলের সব কথায় থাকতে হবে এবং প্রচুর হৈ চৈ করে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে—প্রচুর শব্দোৎপাদনপূর্বক দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করতে না পারিলে এখানে অস্তিত্বই স্বীকৃত হইবে না।' আর সবচেয়ে বড় কথাটি বুঝতে পেরেছে নিত্যপদ আরো পরে। লোকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে পয়সা খরচে কোনো ত্রুটি করে না, চিকিৎসার ব্যাপারে, কারণ ঔষধের দাম কম হইলে তাহার ফল যাহা দাঁড়ায়, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহা ভুলিতে পারা যায়—কিন্তু মামলার তদ্বির বে-তাগ্ হইলে তাহার ফল প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে এবং পুরুষানুক্রমে বহন করিতে হইবে।' এই উপলব্ধি প্রাণের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে মনে আসা সম্ভব নয়।

পল্লীসমাজ নিয়ে আরো উপন্যাস জগদীশ গুপ্ত লিখেছেন, যেমন 'রোমন্থন' বা 'দুলালের দোলা', যদিও কাহিনিসূত্র দুটি উপন্যাসেই ক্ষীণ। কিন্তু পল্লীসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার যে প্রমাণ সেখানে রেখেছে, শুধু সেই কারণেই এগুলি মূল্যবান। 'রোমন্থন' উপন্যাসে শহরের তিন বাবু গ্রাম সম্বন্ধে বহু সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে গিয়েছেন গ্রামে বাস করতে। সেখানে দারিদ্র্যের যে নিদারুণ ও বাস্তব চিত্র তাঁরা পেয়েছেন, বাংলা উপন্যাসে সেই নির্মম চিত্র সম্ভবত আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। সবচেয়ে বড় উপদ্রব দেখা দিয়েছে সেখানে যেখানে সব ব্যাপারে চড়াও হয়ে মোড়লি করার দরকার হয়। বাবুরা তা করতে পারেন নি, সেই কারণে সেখানে বাসের মেয়াদ তাঁদের ফুরিয়েছে। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে একটি কিশোর এফ্. এ. পরীক্ষা দিয়ে গ্রাম দর্শন করতে গিয়েছে। গ্রাম সম্বন্ধে মোহ তারও ছিল, কিন্তু গ্রামের আচার আচরণে যে কুশ্রীতার পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে তারও গ্রামবাস দীর্ঘায়ত হয় নি।

গ) এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি মানুষের জীবনে অনড় হয়ে বসে আছে, তার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রয়াসকে এক ফুৎকারে, সে উড়িয়ে দেয়—এই ধরনের এক অদৃষ্ট-চেতনা জগদীশ গুপ্তের বেশ কিছু উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। 'লঘুগুরু' উপন্যাসে আমরা দেখেছি, গণিকা উত্তম তার আপ্রাণ প্রযত্ন সত্ত্বেও টুকিকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। 'রোমন্থন' উপন্যাসে অভয়ের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এই ক্রূর নিয়তি, এরকম দৃষ্টান্ত তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও প্রচুর আছে, আমরা মূলত দুটি উপন্যাসের উল্লেখ করবো—'রতি ও বিরতি' ও 'অসাধু সিদ্ধার্থ'।

Scanned with CamScanner

'রতি ও বিরতি' উপন্যাসের নায়ক রাম একজন ভিক্ষুক। মানুষ কী করে ভিক্ষুকে পরিণত হয় এবং এই পরিণতি ঘটলে মানুষের কী ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তার যে অসহ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই উপন্যাসে নিয়তির ভূমিকায় দেখা দিয়েছে একটি কালসর্প। এই সর্পের কামড়েই রামের পুত্র মারা যায়, আবার এই কালসর্পের দংশনেই রামের জীবনাবসান হয়েছে। রামের ভাগ্যকে নিয়ে যেন পুতুলখেলা করেছে এই বিষধর সর্প। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত নটবেরর নামে একটি মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর জৈব প্রয়াস দেখিয়েছেন। বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে—নটবরের মতো অতি ঘৃণ্য মানুষ—জীবনে বহু কদর্য কাজ যাকে করতে হয়েছে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য, নিজের পরিচয় বদলে সে সিদ্ধার্থ করে নিয়েছিল, ওই বাঁচারই তাগিদে। জীবনে যতদিন শুধু জৈব অস্তিত্বরক্ষার স্পৃহা ছিল, জীবনধারণে কোনো অসুবিধা তার হয় নি; কিন্তু জীবনে যখন সত্যিই মানুষের মত বাঁচার প্রেরণা এল, শুদ্ধতার চেতনা এল, তখনই তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত করা গেল। নিয়তি এইভাবেই তার শুদ্ধতাভিসার ভেঙে চুরমার করে দিল।

২.৪.৩ ভাষাবিচার

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের নামকরণ ও ভাষাশৈলি সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য বোধহয় করা দরকার। যে সব উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকেই অনুমান করা যাবে, নামকরণের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। 'দুলালের দোলা' 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' কিংবা 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' যে কোনো গুরুগম্ভীর উপন্যাসের নাম হতে পারে এ কথা বিশ্বাস করাই আমাদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে। ছোটগল্পের নামকরণে এইরকম স্বেচ্ছাচার আমরা আরো অনেক বেশি দেখতে পাই।

উপন্যাসের বিষয়ে শুধু নয়, ভাষারীতিতেও এমন এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জগদীশ গুপ্ত, যে সে বিষয়েও কিছু মন্তব্য করা দরকার। জীবনকে যেমন বস্তুগতভাবে দেখেছেন, ভাষাভঙ্গিতেও সেই নির্বোদ মানসিকতা বজায় রেখেছেন লেখক। কেমন যেন সংবাদ পরিবেষণার ভাষা—কোনো উচ্ছ্বাস নেই, বাহুল্য নেই। যেন উপন্যাস লিখছেন না, লিখছেন কোনো প্রবন্ধ। সম্ভবত সেই কারণেই 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক মন্তব্য করেছন—'উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের, বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।'

Scanned with CamScanner